আত্মহত্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল চিরদিনের। অতীত কালে আত্মহনন নিয়ে তেমন তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা না থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু আত্মহত্যা নিয়ে পাড়ার মোড়ে, চায়ের টেবিলে, রকের আড্ডায় আলোচনা চালিয়ে গেছে। বর্তমানে যার জের টেনে আলোচনা এসে পৌঁছেছে ভার্চুয়াল আড্ডা তথা সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনাতেও। আত্মহত্যা ঘটে যাওয়ার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু আলোচনার অন্যতম হল আত্মহত্যাকারীর ব্যক্তিগত জীবনে কোন পাওয়া, না-পাওয়া বা হতাশার কাহিনী খুঁজে বের করা, এবং যদি তেমন স্থূল কোন কারণ সেভাবে চোখে না পড়ে সেক্ষেত্রে নিজের নিজের মত করে, নিজের অভিজ্ঞতা ও শোনা গালগল্পের সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে নিয়ে একটি কাহিনী তৈরি করা হয়। আর যদি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় কোন কালেকটিভ না-পাওয়ার কাহিনী তাহলে সেখানে আন্দোলন, প্রতি আন্দোলনেরও ঢেউ ওঠে। রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা যেভাবে ভারতবর্ষের যুব সমাজ, নিম্নবর্গীয় মানুষের হয়ে বলা কণ্ঠস্বরকে জোরদার করেছিল, নিম্নবর্গের উপর এখনো ঘটে চলা অন্যায়ের যে ছবি জনমানসে ফুটে উঠেছিল, অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের কাহিনী কিন্তু ঠিক তেমন প্রভাব ফেলে নি। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মনে যে তাৎক্ষণিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা হল বিস্ময়। আপাত দৃষ্টিতে সুখী, বিত্তবান, শিক্ষিত এই যুবকটির আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়ার ধারণা। আর তাই ঘটনাটি আসলে আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল জনমানস তথা সোশ্যাল মিডিয়া।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে আত্মহত্যার প্রতি নজর যায় সেই স্কুল বয়সেই, যখন মাঝে মাঝেই বাবামায়ের কাছে তিরস্কৃত হয়ে, পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পেয়ে কিংবা হৃদয় ভেঙে যাওয়া

চেনা বন্ধুটি বলত আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সে সব ঘটনা আত্মহত্যার রূঢ় বাস্তবকে চেনায় নি তখনো। একবার এক প্রানোচ্ছল বন্ধুর আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে যারপরনাই অবাক হয়েছিলাম। অমন ক্রমাগত আড্ডা মেরে চলা, সবসময় হালকা মেজাজে থাকা বন্ধুটি কেন আত্মহত্যা করেছে সেদিন জানতাম না, বুঝতেও পারি নি, অনেক পরে শুনেছিলাম বন্ধুটি অবসাদগ্রস্ত ছিল বহুদিন, চিকিৎসাও চলছিল। এভাবেই জীবনে চেনা বন্ধু, প্রিয় তারকা, স্বল্প পরিচিত বা প্রিয় লেখকের আত্মহত্যা বারবার ধাক্কা দিয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে একটি আলোচনা প্রায়শই উঠে আসত। একদল বলত যে আত্মহত্যা করে সে ভীরু, পালানোর মনোভাব তার, আরেকদল বলত, না, আমি কখনো আত্মহত্যা করতে পারব না, অত সাহস নেই আমার। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম তাহলে আত্মহত্যা কে করে, যে দুঃসাহসী সে, না যে ভীরু সে?

আত্মহত্যাকারী অনেক সময়েই আত্মহত্যার বিপক্ষে সওয়াল করে, এটা তার সচেতন সিদ্ধান্ত, না কি মানসিক ভাবে সে নিজেও জানে না যে সে কখন আত্মহত্যায় উদ্যত হবে, তা বলা কঠিন। আত্মহত্যার সামাজিক দিকটি বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি সাহিত্যে আত্মহত্যার বিবরণ ও বিবর্তনের একটি ক্রমচিত্র তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য ও সময়কে বুঝে নিতে চাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে আমি দেশ বিদেশে আত্মহত্যার ইতিহাস, আত্মহত্যা বিষয়ে নানা দার্শনিক, মনোবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনাকে কেন্দ্র করে বাংলা উপন্যাসের আত্মহত্যার ঘটনাগুলির প্রবণতা বুঝতে চেয়েছি। আত্মহত্যা সম্পর্কে সমাজ মানসে যেমন ক্রম বিবর্তন ঘটেছে ঠিক তেমনই উনিশ বিশ শতকের বাংলা ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যে আত্মহত্যার রূপ বদলেছে।

আত্মোৎসর্গের মহিমা, ব্যক্তিমানুষের চাহিদা, অপ্রাপ্তির ধারণাকে অতিক্রম করে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়েছে আত্মহত্যার ঘটনাগুলিতে।

প্রথম অধ্যায়ে (আত্মহত্যার ইতিহাস) প্রাচীন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কবে আত্মহত্যার প্রচলন হয় সেই ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করেছি। সেই অতীত কাল থেকেই আত্মহত্যার ব্যক্তিগত ও সামাজিক - এই দুই ভিন্ন মাত্রা ছিল। প্রাচীনতম আত্মহত্যার উল্লেখ কবে কোথায় পাওয়া যায় তাও দেখার চেষ্টা করেছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যাকে দেখার ধরন বদলেছে। কখনো আত্মহত্যাকারীকে আত্মহত্যার যথাযথ কারণ দেখাতে বলা হয়েছে, আবার একই সঙ্গে আত্মহত্যাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে দাগিয়ে দিয়ে আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারকেও যথেষ্ট সাজা দেওয়া হয়েছে। দেশ কাল ধর্ম সমাজ ভেদে আত্মহত্যা বিষয়ে ভাবনা ও তার ক্রম বিবর্তনকে পড়তে চেয়েছি আমরা। এমন একটা সময় এসেছে যখন চার্চ অবৈধ ও বৈধ এই দুই প্রকারের আত্মহত্যার কথা বলছে, আসলে আত্মহত্যাকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না তখন। পাশ্চাত্যে আত্মহত্যার ইতিহাসের পাশাপাশি আমরা মূলত এশিয়ার কিছু দেশের আত্মহত্যার কথা জেনেছি এবং বিভিন্ন ধর্মে তথা ধর্মগ্রন্থে আত্মহত্যা নিয়ে কী ধরনের বক্তব্য রাখা হচ্ছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে আত্মহত্যার অতীত ইতিহাসকে খুঁজতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা তুলে ধরেছি দেশ কাল ভেদে জনপ্রিয় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা জনপ্রিয় চরিত্রদের আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

দ্বিতীয় অধ্যায় ‘আত্মহত্যার ধারণা: অতীত থেকে বর্তমান’, সপ্তদশ শতকে ইউরোপে রেনেসাঁর সময় থেকে আত্মহত্যা বিষয়ে মনোভাব অনেকটাই বদলে যেতে থাকে, ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিমানুষের ধারণার সম্প্রসারণের ফলে এই ভাবনা তৈরি হয় যে প্রত্যেকের ভাগ্য বা পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। এই সময় থেকে আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ধারণাও বদলাতে থাকে। আত্মহত্যায় শাস্তি, প্রায়শ্চিত্তের পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যহীনতার কথাও আসে। মনোদর্শন ক্রমাগত আলোচনায় ঢুকে পড়ে।

আত্মহত্যাকে বোঝার জন্য আমরা প্রথমে মানুষের ব্যক্তিতার কথা বলেছি এবং বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে যে আত্মহত্যার গভীর সম্পর্ক আছে তা দেখাতে চেয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক, কান্ট, হেগেল, ফয়ারবাখ, মার্কস, ফ্রয়েড ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ভাবনাকে তুলে ধরতে চেয়েছি সংক্ষেপে। এরপর আমরা আত্মহত্যার ধারণাকে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও মনোবিদের আলোচনা ও আত্মহত্যা বিষয়ে তাঁদের তত্ত্বকে আত্মস্থ করতে চেয়েছি । আলোচনা করেছি ডুর্খেইমের তত্ত্ব, এছাড়াও কার্ল মার্ক্স, মাসারিক, মেনিঙ্গারের বক্তব্যকে বিশদে পড়তে চেয়েছি আমরা। প্রসঙ্গক্রমে একবিংশ শতাব্দীর লেখক অ্যান্ড্রু সলোমনের বিষাদ ও আত্মহত্যার সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাও ঠাঁই পেয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়। গবেষণা করতে গিয়ে আমি বর্তমান সময়ের একজন সাইকোলজিস্ট ও একজন সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি,আত্মহত্যা সম্পর্কে তাদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং সেই নাতিদীর্ঘ দুটি সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে এই অধ্যায়ের শেষে।

তৃতীয় অধ্যায়ের (উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার বিবরণ) একদম শুরুতে আমরা পৌরাণিক কাহিনী তথা রামায়ণ মহাভারতের নানা আত্মহত্যার ঘটনার উল্লেখ করেছি এবং পাশাপাশি মধ্যযুগের নানা সাহিত্যশাখায় আমরা আত্মহত্যার বিভিন্ন রূপ খুঁজেছি অতি সংক্ষেপে। এই আত্মহত্যাগুলি উল্লেখ করার মূল কারণ এই, যে পরবর্তী ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসের শুরুর পর্যায়ে এই আত্মহত্যার কয়েকটি রূপ বা প্রবণতা ফিরে ফিরে এসেছে।

উনিশ শতকে উপন্যাস তৈরি হয়েছে ব্যক্তিমানুষের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়েই, আধুনিকতার অপর পরিণাম আত্মহত্যা, মূলত উপন্যাসেই এইসময় কিছু আত্মহত্যার সম্ভাবনা তৈরি করেছেন লেখকেরা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিক, রমেশচন্দ্র দত্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশররফ হোসেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখের নির্বাচিত উপন্যাসে কিভাবে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এসেছে এবং তা কতটা গল্পের খাতিরে,কতটা সমাজের দলিল হিসেবে উঠে এসেছে সেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি । কখনো কখনো পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত নানা আত্মহত্যার তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি এই আত্মহত্যাগুলিকে। আমরা দেখেছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই সর্বপ্রথম আত্মহত্যার পিছনে থাকা ‘নিঃসঙ্গতা’ নামক সমাজের প্রকৃত অসুখটি ধরা পড়েছে। যদিও আমাদের মনে হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে শুরু হওয়া এই আধুনিকতার যথাযথ উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেন নি তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা। বারবার একই প্রবণতা ফিরে ফিরে এসেছে এই সময়ের উপন্যাসগুলিতে এবং সেই আত্মহত্যার অনুষঙ্গগুলিও কিছু সামাজিক তথা প্রচলিত মোটিফের ক্রমাগত পুনর্নির্মাণ ছাড়া আর কিছু নয়।

চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ ‘বিশ শতকের উপন্যাসে আত্মহত্যা: আধুনিক মানুষের সংকট’-এ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আসে, উনিশ শতকের একদম শেষভাগে ও বিশ শতকের শুরুতে তাঁর উপন্যাসে অতি সামান্য কিছু আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এলেও তার মধ্যে বেশ কয়েকটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে উপনিষদের জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আমরা বুঝতে চেয়েছি কেন আত্মহত্যাকে তিনি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তার মধ্যেও তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে কোথাও আধুনিকতার কোনো লক্ষণ ফুটে উঠেছে নাকি কেবল উনিশ শতকীয় ভাবনার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে তা খতিয়ে দেখেছি। ছোটগল্প আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র নয়, তাই আমরা কেবল একটি-দুটি গল্পের উল্লেখ করে বলতে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে বরং আধুনিক মানুষের সংকট ও সেই সঙ্গে যুক্ত কিছু আত্মহত্যার প্রসঙ্গ বহু বার এসেছে।

রবীন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা প্রভাতকুমারের লেখায় আধুনিকতার সেই সংকট আমরা খুঁজে পাইনি বরং জগদীশ গুপ্তের লেখায় আমরা আত্মহত্যার কারণ হিসেবে 'আত্মনিগ্রহ'-এর মত নিছক আধুনিক ও স্বার্থপর একটি শব্দ খুঁজে পাচ্ছি। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের রচনায় বেশ কিছু আত্মহত্যার নিদর্শন আমরা পেয়েছি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আত্মহত্যায় সমাজের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়েছে। ডুর্খেইম Anomic আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অর্থৈনৈতিক Anomy-র সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের Anomy-র কথাও বলেছিলেন।মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দোপাধ্যায় ,বিমল কর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, শংকর, নবারুণ ভট্টাচার্য ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়দের নির্বাচিত কিছু উপন্যাস অনুকরণে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে আমরা সময়ের অস্থিরতা তথা সমাজের ব্যর্থতার ভূমিকা খুজেছি। এই পর্বের লেখকেরা সচেতনভাবেই আত্মহত্যাকে কোন নির্দিষ্ট কারণ দিয়ে বেঁধে ফেলার ছককে আর

মানতে চাইলেন না। কোনোরকম আড়াল না রেখেই তারা নগ্নভাবে আত্মহত্যার কারণরূপে বিচ্ছিন্নতাকে বা একাকিত্বের বোধকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাইলেন। কেউ কেউ কোন ব্যাখ্যাই করলেন না। এক অতি স্বাভাবিক সত্য হিসেবে আত্মহত্যার কথা বলে গেলেন অনায়াসে। এই অধ্যায়ের লেখকদের রচনায় যে আধুনিকতার সন্ধান পাই তা যে সময়ের ফসল এবং আধুনিক মানুষের সংকট তা বলাই বাহুল্য। আত্মহত্যাগুলিও হয়ে উঠল আধুনিক ও 'অকারণ' আত্মহত্যা।

উপসংহারে (আধুনিক আত্মহনন: অকারণ হনন, নাকি সমবেত হনন?) আত্মহত্যা বিষয়ে সমাজ ও উপন্যাসে প্রবণতার ও ধারণার যে বিবর্তন মাথায় রেখেই বলতে চেয়েছি যে 'অকারণ' আত্মহত্যা বলে আমরা কি দাগিয়ে দিচ্ছিনা সেইসব আত্মহত্যাকেই যার পেছনে আসলে সমাজ, রাজনীতি বা রাষ্ট্রের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।ভারতবর্ষের মত দেশে যখন প্রতিদিন হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে,চুণী কোটাল বা রোহিত ভেমুলাদের বেঁচে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, তখন কেবল মনোবিকলন বা একাকিত্বের কথা বলে 'অকারণ' আত্মহত্যা খোঁজা কি খানিকটা বিলাসিতা নয়। সাহিত্য তো সমাজেরই ছবি, চুণী কোটালকে নিয়েই তো মহাশ্বেতা দেবী 'ব্যাধখণ্ড' লিখবেন।আমরা তাই সমাজ কর্তৃক আত্মহত্যার কথা বলতে চেয়েছি, আত্মহত্যাকে 'সমবেত হনন' হিসাবে দেখতে চেয়েছি যেখানে কেবল আত্মহত্যাকারী নয়, দায়ী সকলেই।